ভারতীয় অভিলেখের ইতিহাস
(Epigraphy)

ভূমিকা

ইংরাজী Epigraphy শব্দটির উৎস গ্রীক উপসর্গ 'Ep' বা 'Epi' যার অর্থ 'উপরে' এবং ধাতু 'graphein' যার অর্থ 'লেখা'। সুতরাং Ephigraphy শব্দটির অর্থ—কোন কিছুর উপরে লেখা অক্ষর, বাক্য বা বাক্যাবলি। ইংরাজীতে 'Inscription' শব্দটি এর সমার্থক শব্দরূপে গণ্য হয়। বাংলায় এর প্রতিশব্দ 'অভিলেখ'। অবশ্য আজকাল 'Epigraphy' বলতে অভিলেখ বিষয়ে চর্চাও বোঝানো হয়।

অখণ্ড ভারতে অসংখ্য অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি খোদাই করা হয়েছে পাহাড়ে, মন্দিরে ও মূর্তির গায়ে ; মাটি, পাথর, ধাতু বা কাঠের তৈরী স্তম্ভে, ফলকে, পাতে বা পাত্রে ; ইটের উপর, কচ্ছপাদি প্রাণীর শক্ত খোলায়, হাতির দাঁতের ফলকে এবং আরো নানা বস্তুর উপরে। ছাঁচে তৈরী মুদ্রা ও সীলমোহরের পিঠে উঁচু-নিচু লেখা (ইংরাজীতে relief), কালি দিয়ে গুহার দেওয়ালে ও কাঠের ফলকে লেখাকেও শিথিলভাবে অভিলেখ বলা হয়। ফারসি-আরবি লিপিতে অনেক ক্ষেত্রে লেখ্য অক্ষরগুলিকে উৎকীর্ণ (খোদাই, inscribe, engrave) না করে সেগুলির চারপাশের জায়গাগুলিকে খুবলে তুলে নিয়ে অক্ষরগুলির রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলিকেও অভিলেখ বলা হয়।

এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, অখণ্ড ভারতে প্রথমে পাথরের গায়েই অভিলেখ উৎকীর্ণ (খোদাই করা) হোত। তবে খ্রীষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিক থেকেই উত্তর -ভারতে তামার ব্যবহার শুরু হয়। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের গায়ে অভিলেখ রচনার রীতিও প্রচলিত ছিল।

শতাধিক বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র খেদোক্তি করেছিলেন যে, আমরা এমন এক জাতি যারা ইতিহাস-জ্ঞানহীন, পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। তাঁর এরূপ উক্তির কিছুকাল পরে বড়লাট লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্ভব ও ক্রমবিস্তৃতির ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস এখন অনেকখানি জানা গেছে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে অভিলেখের আবিষ্কার, সম্পাদনা ও গবেষণা বহুধা বিস্তৃত হয়।

বাঙালী প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস-সাধকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ননীগোপাল মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সরকার, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের আলোচনা প্রধানত ইংরাজী ভাষায়। অবশ্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্র তাঁর 'গৌড়-লেখমালা' গ্রন্থে বাংলায় অভিলেখের সম্পাদনা ও আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য তাঁর অনুসরণে 'কামরূপ-শাসনাবলী' রচনা করেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে

Scanned by CamScanner

দীনেশচন্দ্র সরকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচীতে অভিলেখ পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। তাই এখন অভিলেখের আলোচনা সমধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিক ড. দেবার্চনা সরকারের অভিলেখ বিষয়ে রচিত আকরগ্রন্থ গ্রন্থটি এ বিষয়ে আমাদের সকলের খুবই সহায়ক।

সিন্ধু সভ্যতার যুগের সীলমোহরে প্রাপ্ত অভিলেখই ভারতের প্রাচীনতম অভিলেখ। কিন্তু এগুলির পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। এগুলির কাল আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। প্রায় ২৫০ থেকে ৪০০ এরূপ চিত্রলিপি পাওয়া গেছে। আনুমানিক তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী লিপিতে রচিত অশোকের অনুশাসনগুলিই প্রাচীনতম ভারতীয় অভিলেখ যেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোন কোন অঞ্চলে 'খরোষ্ঠী' লিপিও ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপি লেখা হোত ডানদিক থেকে বাঁদিকে। আফগানিস্তানে গ্রীক ও অ্যারামাইক অক্ষরে লেখা অশোকের কিছু অনুশাসন পাওয়া গেছে। তবে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী লিপিরই প্রাধান্য ছিল এবং ভারতের প্রায় সব আধুনিক লিপিই ব্রাহ্মী লিপির ক্রমবিবর্তিত রূপ। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ প্রিন্সেপ সর্বপ্রথম ব্রাহ্মী বর্ণমালার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারে সফল হন।

সম্রাট অশোকের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকশো বছর ধরে প্রাকৃত ভাষাই ছিল ভারতীয় অভিলেখের প্রধান ভাষা। তবে সাহিত্যে ব্যবহৃত ব্যাকরণ-সম্মত প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য আছে। তাই অনেকে ঐ ভাষাকে অশোক-প্রাকৃত ভাষা বলেছেন। পরে ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষা অভিলেখের জগতে নিজের এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে নেয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই তা উত্তর ভারতের অভিলেখের প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে। তবে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতের প্রাধান্য বিস্তারে সময় লেগেছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। অবশ্য শক-পহ্লব যুগের ও কুষাণ সম্রাটদের কিছু অভিলেখে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম পাদে মথুরার কয়েকটি অভিলেখে ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক দেখা যায়। সম্পূর্ণ সংস্কৃতে রচিত আবিষ্কৃত অভিলেখগুলির মধ্যে প্রাচীনতমটি হোল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত রাজা গাজায়ন সর্বতাতের রাজস্থানের চিতোরগড়ের ঘোসুন্ডি-হাতিবাদা অভিলেখ। অবশ্য এর সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃতের ঈষৎ ছাপ রয়েছে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতক থেকে মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় অভিলেখ রচনার সূত্রপাত হয়। তবে খ্রীষ্টীয় শতকগুলির গোড়ার দিকেই তামিল ভাষায় অভিলেখ রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কন্নড় প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবিড়-গোষ্ঠীভুক্ত ভাষায় অভিলেখ রচিত হয়েছে। পরে অনেক ইন্দো-মুসলিম অভিলেখে আরবি ও ফারসি ভাষা ও লিপি দেখা যায়।

স্থূলভাবে অভিলেখগুলিকে সরকারী ও অসরকারী ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সরকারী অভিলেখগুলি সমকালীন শাসক বা শাসনতন্ত্রের পক্ষ থেকে রচিত। অসরকারীগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রচিত হয়েছে। সরকারী অভিলেখগুলিকে চারটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) রাজানুশাসন—যেমন, অশোকের অনুশাসন।

(২) রাজার কীর্তিগাথা—যেমন, শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি। এগুলি সাধারণত কোন ভাল কবির রচনা। কোন কোন ভাল কবির নাম ও রচনা কেবল অভিলেখের মধ্যেই বেঁচে আছে।

(৩) দানপত্র—যেমন, হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসন ; দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন।

(৪) বিচিত্র বা মিশ্র।

অসরকারী অভিলেখগুলি সাধারণত স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা। ফলে তাতে ভাষা, ব্যাকরণ ও বানানের অজস্র ভুল দেখা যায়।

ভূমিদান-বিষয়ক অভিলেখগুলির সাধারণ নাম 'শাসন'। এগুলিতে 'খিল' প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন ধরনের জমির পারিভাষিক নাম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে, কোন রাজা কাউকে কোন জমি বা সম্পদ দান করলে পরবর্তী ভদ্ররাজাদের অবগতির জন্য তার বিবরণ কোন বস্ত্রখণ্ডে বা তাম্রফলকে লিপিবদ্ধ করবেন। অসরকারী অভিলেখগুলির অধিকাংশই কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অথবা কোন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দানপত্র। অনেক সময় তীর্থযাত্রীরা তাদের দানের কথা মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করাতেন। অনেক অভিলেখে পুষ্করিণী খননাদি জনহিতকর কাজের কথা স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। এসব অসরকারী অভিলেখেও সাধারণত দেশের ও দেশের রাজার নামের উল্লেখ দেখা যায়। ফলে এগুলিও কোন বিশেষ যুগের কোন বিশেষ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ভূসংস্থান প্রভৃতি জানতে সাহায্য করে। যেমন—তামিলনাড়ুর চিঙ্গলপুট জেলার উত্তিরমেরুর অভিলেখসমূহ। এগুলি থেকে আমরা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে দক্ষিণ ভারতের গ্রামশাসন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি।

তাম্রশাসনগুলির শেষের অংশে এক বা একাধিক 'ধর্মানুশংসন' নামক শ্লোক দেখা যায়। সেগুলি মহাভারত, পুরাণ বা কোন ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত হোত। এতে ভূমিদান ও দাতার প্রশংসা, দানের অমর্যাদাকারী ও দানের অপহারকের উদ্দেশ্যে অভিশাপ বা নিন্দা আছে।

যেমন—"ষষ্টি-বর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ।।"

ভূমিবিক্রয়-সংক্রান্ত দলিলেও এরূপ ধর্মানুশংসন আছে। যা এগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। অভিলেখগুলির প্রারম্ভে এবং কখনো কখনো শেষেও 'স্বস্তি', 'সিদ্ধম্' প্রভৃতি মাঙ্গলিক শব্দের ব্যবহার বা দেবদেবীর স্তুতি করার রেওয়াজ ছিল। স্বস্তিক, ত্রিরত্ন বা নন্দিপদ, শ্রীবৎস প্রভৃতি কিছু অন্য প্রতীকও কোন কোন অভিলেখে দেখা যায়। সম্ভবত খোদাইকারীর ইচ্ছামত কোন কোন অক্ষরকে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা হোত। কিন্তু সাধারণভাবে শব্দ বা শব্দসমষ্টির মধ্যে ফাঁক রাখার রীতি ছিল না। কোন কোন অভিলেখের শেষে অবশ্য বাক্য, শ্লোকার্ধ ইত্যাদির পরে বিরামচিহ্ন দেখা যায়। মধ্যযুগীয় কোন কোন অভিলেখের উপরদিকের অংশে শিবলিঙ্গ, নন্দী (শিবের ষাঁড়), চন্দ্র, পদ্ম, বৃত্ত, সূর্য ইত্যাদি অঙ্কিত হয়েছে। কোথাও কোথাও বাদ পড়ে যাওয়া অংশ বোঝাতে কাকপদ বা হংসচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে এবং মার্জিনে তা লেখা হয়েছে। ভুল অক্ষর খুঁড়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে অথবা দুটি রেখা দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অনেক অভিলেখে তার রচয়িতার নাম, লিপিকর বা খোদাইকরের নাম, শাসনকর্তার রাজ্যবর্ষ বা শকাব্দাদি অনুসারে বৎসর, মাস, পক্ষ, দিন, তিথি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কোথাও কোথাও অবটুনক (পৌষ-মাঘ) প্রভৃতি যবনমাসের নাম দেখা যায়।

তাম্রপট্ট প্রভৃতিতে রচিত অভিলেখ বিভিন্ন রাজ্যের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পর্বতগাত্র ও স্তম্ভগাত্রের অভিলেখগুলি সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এ যাবৎ প্রায় একলক্ষ অভিলেখ আবিষ্কৃত হলেও সবগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার কাজ এখনো শেষ হয়নি। মৌর্য ও গুপ্তযুগের অনেক অভিলেখ 'Corpus Inscriptionum Indicarum' নামক সংকলনের বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সরকারের অসাধারণ কীর্তি *'Select Inscriptions'* নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিলেখ সঙ্কলিত হয়েছে। এছাড়াও আরো অনেক সঙ্কলন গ্রন্থ আছে। *'Epigraphica Indica'* নামক সঙ্কলনে অভিলেখসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত ও আলোচিত হয়ে থাকে। শ্রদ্ধেয় রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রকুমার মাইতি সম্পাদিত *'Corpus of Bengal Inscriptions'* বঙ্গীয় অভিলেখের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দীনেশচন্দ্র সরকারের *'Indian Epigraphy'* ও *'Indian Epigraphical Glossary'* একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অভিলেখের গুরুত্ব

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের মধ্যে অভিলেখের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। Fleet সাহেব বলেছেন—"Hardly any dates and identifications can be established except from them." এই গুরুত্বের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান।

প্রথমত, এগুলি পাথর, তামা ইত্যাদি স্থায়ী পদার্থে উৎকীর্ণ হওয়ায় তালপাতা, ভূর্জপত্র ইত্যাদি স্বল্পস্থায়ী পদার্থে লিখিত পুঁথির তুলনায় এগুলিতে খোদিত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ দীর্ঘস্থায়ী ও অপরিবর্তিত আছে। দ্বিতীয়ত, এগুলি কোন রাজা, রাজকর্মচারী বা বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত হওয়ায় তাঁদের ও তাঁদের সময়কার অনেক তথ্য এগুলিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, এগুলি অপরিবর্তনীয় হওয়ায় ঐতিহাসিক তথ্যরূপে নির্ভরযোগ্য। চতুর্থত, এগুলি অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে এমন অনেক তথ্যের আকর যা অন্য কোন উৎস থেকে জানা যায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্য আকর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা অভিলেখের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হয়। যেমন বাণভট্টের হর্ষচরিত পাঠ করলে মনে হয় না যে, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা ও মধুবন তাম্রশাসনে স্পষ্টভাবে রাজ্যবর্ধনকে পরিপূর্ণ রাজকীয় উপাধিসহ বর্ণনা করার পর বোঝা যায় যে, শশাঙ্কের হাতে নিহত হবার আগে পর্যন্ত তিনি রাজা ছিলেন। পঞ্চমত, এগুলিতে সমসাময়িক ব্যক্তি ও ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত রাজপ্রশস্তিতে, পৃষ্ঠপোষক রাজার পূর্বপুরুষদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই রচয়িতা নথিবদ্ধ দলিলাদি সংগ্রহ করে যথার্থতা বিচার করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'কুন্তলগড় অভিলেখ' উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠত, অনেক অভিলেখে বিভিন্ন রাজবংশ তাদের বংশের পত্তন

থেকে শুরু করে তাদের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রবিকীর্তি বিরচিত আইহোল প্রশস্তিতে বাদামির চালুক্য-বংশীয় রাজাদের উত্থান থেকে শুরু করে প্রায় শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। পালবংশ, রাষ্ট্রকূটবংশ প্রভৃতি আরো রাজবংশের ইতিহাস অভিলেখ থেকে জানা গেছে। সব ক্ষেত্রে না হলেও, বেশ কিছু অভিলেখে (যেমন চালুক্য বংশের দানপত্রগুলিতে) অতীত রাজাদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল সাল-মাস-তারিখ সহ লেখা হয়েছে। সপ্তমত, পুঁথির মত লিপ্যন্তরের ফলে পাঠান্তরের সম্ভাবনা অভিলেখগুলিতে প্রায় থাকেই না। ফলে পুঁথির তুলনায় এগুলির প্রামাণ্য বেশি। অষ্টমত, অনেক অভিলেখে রচনার সাল তারিখের উল্লেখ না থাকলেও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা তা প্রায় সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায়। নবমত, বলা যায়, প্রাচীন ভারতের কালানুক্রমের অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান অভিলেখের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। বহু অভিলেখে বিক্রমসংবৎ ও শকাব্দ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেক অভিলেখে বিশেষ বিশেষ তারিখসহ কালের উল্লেখ দেখা যায়। এমন কিছু অভিলেখও পাওয়া গেছে যাতে বিভিন্ন সময়ের ঘটনা-পরম্পরাকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ—সিরণ খুর্দ (সিয়া ডোণী) অভিলেখ।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অভিলেখ-রচয়িতা তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার বিরাগভাজন হবার ভয়ে রাজার অপ্রীতিকর তত্ত্ব গোপন করেছেন। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—চালুক্যদের কেন্দপুর তাম্রপত্রে বলা হয়েছে যে, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য শত্রুদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। অনেক সময় রাজপ্রশস্তিতে ইতিহাস-নিষ্ঠার চেয়ে রাজার স্তুতি ও কাব্যিক উচ্ছ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া অভিলেখের পরিসর ছোট হওয়ায় তার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার বিশদ প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়নি। বিশেষত রাজার বংশলতিকার অংশে সাধারণত পূর্বতন রাজাদের নামটুকু মাত্র পাওয়া যায়, বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য হর্ষবর্ধনের 'বাঁশখেরা তাম্রশাসনে' তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের নামের সঙ্গে তাঁদের ধর্মমত ও রাণীদের নামের উল্লেখ আছে। জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গণনার ভুলে কোন কোন অভিলেখের নির্দিষ্ট রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে রাজাদের বংশ গরিমার অতিরঞ্জন আছে। বিশেষত রাজবংশের গোত্রনামের ভিত্তিতে বিস্তৃত বংশলতিকা প্রস্তুত করার রীতি প্রচলিত হলে এই অতিরঞ্জনের সূত্রপাত হয়। যেমন, বিষ্ণুকে অনন্তবর্মন্ চোড়গঙ্গের আদিপুরুষ বলা হয়েছে। মহাকূট স্তম্ভ অভিলেখে বাদামির চালুক্যরাজ প্রথম কীর্তিবর্মা (৫৬৬-৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ-মদ্রক প্রভৃতি বহু দেশের রাজাদের পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি সুদূর অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ জয় করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, আইহোল প্রশস্তিতে তাঁকে কেবল নল-মৌর্য-কদম্বদের বিনাশকারী রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একই রাজবংশের প্রশস্তিগুলির মধ্যে প্রাচীনতর প্রশস্তির তথ্যই বেশি প্রামাণ্যরূপে গ্রহণীয়।

অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্কার ও অর্থের ঐশ্বর্য-প্রদর্শনের মোহে প্রশস্তি-রচয়িতা কবি ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে যে রাজাদের উত্তরাপথপতি বা দক্ষিণাপথপতি বলা হয়েছে,

Scanned by CamScanner

তাঁরা হয়তো তার এক অংশের অধিপতি ছিলেন। যেমন, কেবল বঙ্গ বিহারের অধিপতি দেবপালকে সারা ভারতের অধীশ্বর বলা হয়েছে। অনেক সময় কোন রাজা বন্ধুত্ববশত অন্য রাজাকে উপহার পাঠালেও তাকে অধীনস্থ সামন্ত রাজার উপঢৌকনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত খোদাইকর বা স্বর্ণকারের দ্বারা খোদাই করায় অনেক শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদিতে মারাত্মক ভুল ঘটে গেছে। বিশেষত অসরকারী দলিলগুলিতে এরূপ ত্রুটি বেশি ঘটেছে। আবার একই রাজবংশের বিভিন্ন দলিলেও স্ববিরোধী উক্তি দেখা যায়। তাই সত্য উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং অভিলেখের বিশাল গুরুত্ব থাকলেও অন্য প্রমাণের আলোকে তার মূল্যায়ন করে তবেই তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত।

সাহিত্যমূল্য

ভারতীয় অভিলেখগুলি যে কেবল প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের এক অপরিহার্য উপাদান তাই নয়, সেগুলি সাহিত্যের ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদানরূপেও গণ্য। ম্যাক্সমুলার সাহেব এক মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রধান পুরাণগুলির মূল রূপ রচিত হবার পর থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ভারতে সাহিত্য রচিত হয়নি। গুপ্তযুগে তার নবজাগরণ ঘটে। কিন্তু তাঁর এই মতবাদ অন্য কিছু কিছু প্রমাণের সঙ্গে অভিলেখের প্রমাণের সাহায্যেও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃতে রচিত রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ, প্রাকৃতে রচিত সিরি পুলুমায়ির নাসিক শিলালেখ প্রভৃতি কয়েকটি অভিলেখের অসামান্য কাব্যগুণ বিচার করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এগুলির পিছনে রয়েছে সালঙ্কার কাব্যরচনার এক দীর্ঘ প্রাক্ ইতিহাস। তাই এরূপ সাহিত্য-গুণসম্পন্ন কিছু অভিলেখের আলোচনা করা হোল।

প্রাকৃত অভিলেখ

অশোকের (আনুমানিক ২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) চতুর্দশ পর্বত-অনুশাসনে বলা হয়েছে—বিষয়ের অর্থমাধুর্যের কারণেই তিনি কোন কোন কথা বার বার লিখিয়েছেন (অস্তি চ এত কং পুন পুন বুতং তস তস অথস মাধূরতায়)। এখানে কাব্যতত্ত্বে বর্ণিত অর্থগত মাধুর্যের প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল হবে না। তুলনীয় কাব্যাদর্শের—"মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ"।

কুররম অভিলেখ : প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী লিপিতে সম্ভবত ৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শাক্যমুনির দেহাবশেষ-ধারক এক ক্ষুদ্র সম্পুটে উৎকীর্ণ পেশোয়ারের কুর্‌রম নামক স্থানে প্রাপ্ত অভিলেখে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদ বা কার্য-কারণ নীতি বিবৃত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখ : ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি পর্বতে উৎকীর্ণ (খোদাই করা) নির্মেদ প্রাকৃত গদ্যে লেখা এই অভিলেখটি প্রাচীন সাহিত্যিক গদ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অলঙ্কারের আড়ম্বর না থাকলেও এই গদ্য সুশ্রাব্য, সাবলীল, সুপাঠ্য এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ঔচিত্যসম্পন্ন সঙ্গতিবিশিষ্ট।

নানাঘাট অভিলেখ : পুণে জেলার নানাঘাটে প্রাপ্ত এই অভিলেখটি সাতবাহন নরপতি প্রথম সাতকর্ণির রাজত্বকালে সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে প্রথম সাতকর্ণির মহিষী নায়নিকা বা নাগনিকা সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি পড়লে সংস্কৃত গদ্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যে ব্যবহৃত বিশেষণ-শ্রেণীর কথা মনে পড়ে। অভিলেখের প্রারম্ভে ইন্দ্রাদি চার দিকপালের বর্ণনা পড়ে মহাকাব্যের প্রারম্ভে নমস্ক্রিয়ার কথা স্মরণে আসে। এর গদ্যশৈলী প্রায় দীর্ঘসমাসবদ্ধ-পদবিহীন, সরল ও ঋজু। কাব্যাদর্শে দণ্ডিবর্ণিত বৈদর্ভমার্গের আদিরূপ এই অভিলেখে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়।

পুলুমায়ির নাসিক অভিলেখ : মহারাষ্ট্রের নাসিকে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত কয়েকটি অভিলেখ পড়ে বোঝা যায়, রচয়িতাদের প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সাতবাহন রাজা সিরি পুলুমায়ির (আনু. ১৩০-১৫৯ খ্রীঃ) ১৯তম রাজ্যবর্ষে রচিত অভিলেখটি প্রাকৃতে রচিত হলেও মনে হয় এটি সংস্কৃত থেকে কোন বিদগ্ধ কবির প্রাকৃতে অনুবাদ। মাত্র তিনটি বাক্যে রচিত এই প্রশস্তির গদ্যশৈলী যেন পরবর্তী কালের দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণভট্টের গদ্য রচনাশৈলীর পূর্বাভাস। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির বর্ণনায় ব্যবহৃত বিশেষণমালা যেন উত্তরকালের কবিগণ কর্তৃক রাজা বা নায়কের বর্ণনার অগ্রদূত। এই বর্ণনায় অনুপ্রাস ও উপমা অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার ও পৌরাণিক রূপকল্পের আশ্রয় লক্ষণীয়। প্রসাদগুণের সুন্দর প্রয়োগ, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে সমাসবিহীন পদের নিয়মিত প্রয়োগে রচনাটি স্বচ্ছন্দপাঠ্য। পরবর্তীকালের গদ্যকাব্যের পূর্বসূরীরূপে একে গণ্য করা যায়।

সংস্কৃত অভিলেখ

রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখ : গুজরাতের জুনাগড়ে শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের প্রশস্তিরূপে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ একটি অভিলেখ পাওয়া গেছে। এতেই ৭২ শকাব্দের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় যে, ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে এটি উৎকীর্ণ হয়েছিল। প্রবল ঝঞ্ঝা ও বর্ষণে পর্বতে বাঁধ বেঁধে তৈরী সুদর্শন হ্রদের বাঁধ ভেঙে তার জলশূন্য হয়ে যাওয়া, ফলে জলাভাবে ঐ অঞ্চলের জনগণের দুর্দশা এবং রুদ্রদামনের নির্দেশে বাঁধের পুনর্নির্মাণের বর্ণনার সঙ্গে এতে রুদ্রদামনের অসামান্য গুণাবলী ও কীর্তিকলাপের বর্ণনাও আছে। এ যাবৎ আবিষ্কৃত উচ্চ কাব্যগুণসম্পন্ন অভিলেখগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতম। প্রসাদ ও ওজোগুণে সমৃদ্ধ ঋজু গদ্যে বৈদর্ভী রীতিতে রচিত এই অভিলেখটি বিরচিত। দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণভট্টের গদ্যকাব্যের সুযোগ্য পূর্বসূরী এই গদ্যে রচিত অভিলেখ। কাব্যসৌন্দর্যের নিরিখে এটি যে কোন উত্তম কবির রচনা

[illegible] সুরক্ষীয়। এই অভিলেখের রচয়িতা অজ্ঞাতনামা কবি বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির যে অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। এই বর্ণনার অংশবিশেষ—"পর্জন্যেন একার্ণবভূতায়ামিব পৃথিব্যাং কৃতায়াং গিরেরূর্জয়তঃ সুবর্ণসিকতা-পলাশিনী-প্রভৃতীনাং নদীনাম্ অতিমাত্রোদ্বৃত্তৈর্বেগৈঃ সেতুম্.........যমনানুরূপ-প্রতীকারমপি গিরি-শিখর-তরুতটাট্টালকোপ-তল্প-দ্বার-শরণোচ্ছ্রয়-বিধ্বংসিনা যুগ-নিধন-সদৃশ-পরম-ঘোরবেগেন বায়ুনা প্রমথিত-সলিল-বিক্ষিপ্ত-জর্জরীকৃতবদীর্ণ.....ক্ষিপ্তাশ্ম-বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-প্রতানম্ আনদী-তলাদিত্যুদ্ঘাটিতমাসীৎ।"

এই অভিলেখের একটি বড় কাব্যতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক গুরুত্বও লক্ষণীয়। এতে কাব্যতত্ত্ব [illegible] থেকে বোঝা যায়, সে যুগে বহু গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য রচিত হোত, [illegible] হোত এবং সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থও রচিত হোত। রুদ্রদামনের [illegible] প্রসঙ্গে এই অভিলেখে লেখা হয়েছে—"স্ফুট-লঘু-মধুর-চিত্র-কান্ত-শব্দ-সময়োদারালঙ্কৃত-গদ্য-পদ্য-কাব্য-বিধান-প্রবীণেন...।" এই বর্ণনা কাব্যাদর্শে বৈদর্ভমার্গের প্রাণস্বরূপ [illegible] গুণগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ঐ সময়ে কাব্যরচনার আদর্শ কী ছিল তা এই [illegible] রচনাশৈলী ও উক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। অনুপ্রাস ও যমকের [illegible] সুষম প্রয়োগে রচনাটি প্রকৃত কাব্যরূপে গণ্য। এই অভিলেখ থেকে সুদর্শন হ্রদের [illegible] এবং রুদ্রদামনের রাজত্ব, রাজ্য ও করব্যবস্থা সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। [illegible] ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কালক্রমে লেখাটির কিছু কিছু অংশ [illegible] অনেক ক্ষেত্রে অর্থবোধের জন্য কিছুটা অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়।

[illegible] এই রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু কিছু নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। যেমন—[illegible] প্রভৃতি', 'অনুপসৃষ্টপূর্ব' প্রভৃতি। তবে তার ফলে রচনাটির [illegible] কোনরকম হানি ঘটেনি।

মেহরৌলি স্তম্ভলেখ : দিল্লীর কাছে মেহরৌলির লৌহস্তম্ভে খোদিত একটি অভিলেখ সাহিত্যগুণে উল্লেখযোগ্য। এতে 'চন্দ্র' নামে কোন রাজার প্রশস্তি আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই চন্দ্র হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন শ্লোকে চন্দ্রের শৌর্য-বীর্য বর্ণিত হয়েছে। বৈদর্ভী রীতিতে রচিত শ্লোকগুলিতে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের যুগপৎ সাবলীল মিশ্রণ, বীররসের ঘনীভূত আশ্চর্য প্রকাশ, কোথাও বা কারুণ্যের স্পর্শ থেকে স্পষ্ট মনে হয়, এই প্রশস্তির অজ্ঞাতনামা রচয়িতা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি।

যেমন— "খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্যা কর্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহান্-
অদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিত-রিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্।।"

উদ্ধৃত শ্লোকটিতে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাবলীল সমন্বয় প্রমাণ করে এই অভিলেখের রচয়িতা ছিলেন একজন উত্তম কবি।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি : এই অভিলেখটি ৩৫ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভে খোদিত হয়েছে। স্তম্ভটি আগে ছিল উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বীতে (বর্তমান কোশামে)। সুলতান ফিরোজ

শাহ্ তুঘ্লক্ স্তম্ভটিকে এলাহাবাদে আনান। এই স্তম্ভে মৌর্যসম্রাট অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ ছিল। অনেকের মতে অশোকের মতবাদের বিরোধী রূপে নিজের অবস্থানকে তুলে ধরতে সমুদ্রগুপ্ত এই স্তম্ভটিকে নির্বাচিত করেছিলেন।

এই অভিলেখের ভাষা সংস্কৃত। রচয়িতা হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের খাদ্যকূটপাকিক, সান্ধিবিগ্রহিক, কুমারামাত্য ও মহাদণ্ডনায়ক—এই চারটি উচ্চপদের আধিকারিক। অভিলেখটি পদ্য ও গদ্যের সুষম সংমিশ্রণে চম্পূকাব্যের ধরনে রচিত। এরূপ রাজস্তুতিকে অলঙ্কারশাস্ত্রে বিরুদ শ্রেণীর কাব্যও বলা হয়। রচনাটিতে প্রথমে ৮টি শ্লোক ও তার পর গদ্যে রচিত একটি সুদীর্ঘ বাক্যের পর আর একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য বাক্য আছে। ৩৩টি পঙ্ক্তিতে এটি খোদিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেক পঙ্ক্তি ভেঙেচুরে অপাঠ্য হয়ে গেছে। প্রথম তিনটি পঙ্ক্তির দুয়েকটি অক্ষর এবং চতুর্থ পঙ্ক্তির কয়েকটি অক্ষর বাদে বাকি অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। পঞ্চম পঙ্ক্তির প্রথমার্ধ পড়া গেলেও শেষার্ধের মাত্র কয়েকটি অক্ষর পড়া যায়। সমগ্র অষ্টম পঙ্ক্তি এবং নবম পঙ্ক্তির প্রথমার্ধ মোটামুটি অক্ষত। বাকিগুলি পড়া যায়। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এর লিপি উত্তরকালীন উত্তরভারতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মী লিপি। এই লিপির আদি গুপ্তযুগের কৌশাম্বী শৈলী লক্ষণীয়। রচনাটিতে ব্যাকরণগত ভুল না থাকলেও লিপিকরের প্রমাদবশত কিছু বানান ভুল আছে। যেমন—প্রিথিব্যাম্ (পৃথিব্যাম্), সন্ত্র (মন্ত্র), কুমারদেব্যামুৎকন্নস্য ('প' হবে), খাদ্যপাটিক (খাদ্যকূটপাকিক হবে)। বানানশৈলীতে সেকালের অনেক অভিলেখের মতই বর্ণদ্বিত্বের বাহুল্য রয়েছে। অভিলেখটিতেই বলা হয়েছে, এটি উৎকীর্ণ (খোদাই) করার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মহাদণ্ডনায়ক তিলকভট্টক।

গুপ্তবংশীয় প্রবল পরাক্রমী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বংশপরিচয়, শৌর্য-বীর্য, দিগ্বিজয়, কলানৈপুণ্য এবং রাজকীয়, সাহিত্যিক ও মানবিক বহুমুখী গুণাবলীর বর্ণনাই অভিলেখটির মূল বিষয়। শেষে স্তম্ভটির সালঙ্কার বর্ণনা এবং কবির বিনীত আত্মপরিচয় আছে। একেবারে শেষের সংক্ষিপ্ত বাক্যটি ছাড়া বাকি অংশটি একটিমাত্র বৃহৎ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত।

একটিমাত্র বাক্যের বিশাল বর্ণনাতেও কোথাও ভারসাম্য বিনষ্ট হয়নি। এখানেই কবি হরিষেণের অপূর্ব মুন্সিয়ানা। এই রচনায় মন্দ্রাক্রান্তা, শার্দূল-বিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরার মত দীর্ঘ গম্ভীর ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের গগনচুম্বী মহিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ছন্দ, অলঙ্কার, গুণ-রীতি, রস প্রভৃতি কাব্যিক উপকরণের যথাযথ ও সুসমঞ্জস প্রয়োগে নৈসর্গিকী কবিপ্রতিভার অধিকারী হরিষেণের রচনাটি এক উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শন। অনেকের মতে রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা হরিষেণের সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ওজোগুণভূষিত বৈদর্ভীরীতিতে বিরচিত ভাষায় রচিত এই প্রশস্তিটি এক অনুপম কাব্যের নিদর্শন। অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে রচনাটি মনোরম।

উদাহরণ—"সাধ্বসাধূদয় প্রলয়হেতু-পুরুষস্যাচিন্ত্যস্য ভক্ত্যবসতি-মাত্র-গ্রাহ্য-মৃদু-হৃদয়স্যানুকম্পাবতোনেক-গো-শত-সহস্র-প্রদায়িনঃ কৃপাণ-দীনানাথাতুর-জনোদ্ধরণ-মন্ত্র-দীক্ষাভ্যুপগত-মনসঃ সমিদ্ধস্য বিগ্রহবতো লোকানুগ্রহস্য"। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সমুদ্রগুপ্তের যুবরাজ পদে নির্বাচনের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি মানসপটে যেন এক চলচ্চিত্রের মত ভেসে ওঠে।

Scanned by CamScanner

"আর্য্যো (অথবা 'এহো') হীত্যুপগুহ্য ভাব-পিশুনৈরুৎকর্ণিতৈ রোমভিঃ
সভ্যেষূচ্ছ্বসিতেষু তুল্য-কুলজ-ম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ।
স্নেহ-ব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি ।।"

ভারত-ইতিহাসে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের যুগান্তকারী ঘটনাটি এই শ্লোকে অতি সুন্দর কাব্যিক শৈলীতে চিত্রিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব : এই অভিলেখের ২৮-২৯ পঙ্‌ক্তিতে সমুদ্রগুপ্তের বংশপরিচয় আছে। সমুদ্রগুপ্ত মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র, মহারাজ শ্রী ঘটোৎকচের পৌত্র, মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীর গর্ভে জাত। শ্রীগুপ্তকে মহারাজ বলায় বোঝা যায়, তিনি সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন না। ঘটোৎকচও তাই। সুতরাং এই বংশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি ছিলেন উক্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠানের স্মারক রূপে তিনি ৩১৯-৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ নামে এক নতুন অব্দের (বর্ষ গণনার) প্রচলন করেন। তাঁর বা সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রায় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর যুগল-প্রতিকৃতি এবং গৌণপার্শ্বে লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে 'লিচ্ছবয়ঃ' কথাটি উৎকীর্ণ দেখা যায়। গৌরবে বহুবচনে প্রযুক্ত 'লিচ্ছবয়ঃ' পদটি থেকে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে গণরাজ্যরূপে লিচ্ছবিদের বিশিষ্ট অস্তিত্ব বজায় ছিল। লিচ্ছবিরাজ-কন্যাকে বিবাহের ফলে বৈশালী (বর্তমান মজঃফরপুর) তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অভিলেখের চতুর্থ শ্লোকটির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সাধারণত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজপদে অভিষিক্ত হতেন। কিন্তু এই শ্লোকে উত্তরাধিকারীরূপে পিতাকর্তৃক সমুদ্রগুপ্তের নির্বাচনের বর্ণনায় বোঝা যায় যে, উক্ত নিয়ম সর্বদা অনুসরণ করা হোত না। ঘটনাটি যুগান্তকারী।

অনুমান করা যায়, রাজনৈতিক কোন জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত এরূপ নির্বাচন করেছিলেন। অনেকের মতে 'কাচ' নামে সমুদ্রগুপ্তের এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কারণ তিনিই ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তিনি কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। কেননা, কাচের নামাঙ্কিত মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাণ্ডারকরের মতে তিনিই রামগুপ্ত। অবশ্য হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে 'কাচ' আসলে সমুদ্রগুপ্তেরই অন্য এক নাম। কেননা, কাচের মুদ্রায় উৎকীর্ণ 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' বিশেষণটি গুপ্ত রাজাদের সব সরকারী নথিতেই একমাত্র সমুদ্রগুপ্তেরই বিশেষণমূলক উপাধি। দীনেশচন্দ্র সরকারও এই মত সমর্থন করেছেন। তাঁর ও Allan সাহেবের মতে দিগ্বিজয়ের পূর্বে সমুদ্রগুপ্তের নাম ছিল কাচ। দিগ্বিজয়ের পরে তিনি পিতার নামের সঙ্গে মিলিয়ে 'সমুদ্রগুপ্ত' নাম ধারণ করেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থ অনুযায়ী ভস্মম্ নামে সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনদিন রাজ্যশাসন করেছিলেন। মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের মতে তাঁরই অপর নাম 'কাচ'।

দিগ্বিজয় : আলোচ্য অভিলেখে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস বিধৃত আছে। তিনি নয়জন আর্যাবর্তরাজকে উন্মূলিত করে তাঁদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আটবিক রাজ্য, প্রত্যন্তদেশ [সমতট অর্থাৎ সম্ভবত বর্তমান নোয়াখালি ও কুমিল্লা, যশোহর ও খুলনা

অঞ্চল] যার রাজধানী ছিল কর্মান্ত-নগরী। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে কুমিল্লার কাম্‌তা বা বড়কাম্‌তা ডবাক, অনেকের মতে ঢাকা অঞ্চল, অন্যদের মতে উত্তরবঙ্গের বগুড়া, রাজশাহি, দিনাজপুর অঞ্চল। মতান্তরে ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশ অথবা অসমের কোপিলি-যমুনা কোলঙ্ উপত্যকা ; কামরূপ অর্থাৎ উত্তর অসম ; নেপাল কর্তৃপুর ; অর্থাৎ জলন্ধরের অন্তর্গত কর্তারপুর, কুমায়ুন, গাহড়ওয়াল ও রোহিলখণ্ড। কৌম গোষ্ঠী বা উপজাতি রাজ্য, বৈদেশিক রাজন্য ও দ্বীপবাসীদের উপর সমুদ্রগুপ্ত প্রভাব ও একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বারো জন রাজাকে পরাজিত করেও তিনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। একে বলা হয়েছে ধর্মবিজয়। তবে তা অশোকের ধর্মবিজয় নয়। সম্ভবত সুদূর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এই কাজ করে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন মাত্র। পূর্বভারত, পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নেপালের রাজারা তাঁকে করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অধীনতা স্বীকার করেন। প্রাচীন মালব ও যৌধেয়সহ নয়টি গণসঙ্ঘ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। দৈবপুত্রষাহিষাহানুষাহি (সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কো কুষাণ শাসক) এবং শকমুরুণ্ড (সম্ভবত কোন শকশাসক) এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপে অধিবাসীরা তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। তিনি অচ্যুত, নাগসেন, গ-আদ্যক্ষরবিশিষ্ট এ রাজাকে (অনেকের মতে গণপতি নাগকে), উন্মূলিত করেন। পুষ্পাহ্বয় নগরে তিনি হেলা কোতকুলজাত এক রাজা বা রাজপুত্রকে বন্দী করেন। অনেকের মতে পুষ্পাহ্বয় হল পাটলিপু অন্যদের মতে কান্যকুব্জ। কোতকুল কারো মতে বুলন্দশহরের শাসক কোটা পরিবার। কা মতে কোত হল কোচ জাতি, কারো মতে কোত উপজাতি। মনে করা হয় যে, সমুদ্রগু রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। অন্য অনেকে অবশ্য মনে করেন যে পুষ্পাহ্বয় নগর হল কান্যকু (কনৌজ) এবং সেটাই সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল। কেননা, কান্যকুব্জ থেকে তাঁর দিগ্বি বর্ণনার সুষ্ঠুতর ব্যাখ্যা সম্ভব। অনেকের মতে পাটলিপুত্র ও কান্যকুব্জ, এই দুটিকেই কুসুমপু বলা হোত।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা পড়ে মনে হয়, উত্তরপ্রদেশের বিপুল অংশে, মধ্যপ্রদেশে কিছু অঞ্চলে ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আলো অভিলেখ থেকে ভারতবর্ষের তৎকালীন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাগ, উপজাতি-অধ্যু রাজ্যসমূহ ও বৈদেশিক কিছু রাজ্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগু অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা নেই, তাঁর উত্তর পুরুষদের অভিলেখে আছে। থাপার সাহেবের মতে অভিলেখে কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে। এতে উল্লেখিত সব রাজাই সমুদ্রগুপ্তের অধী করদ শাসক ছিলেন না।

সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলী : আলোচ্য অভিলেখে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক নৈপুণ্যের বিস্তৃত ব আছে। তিনি নানাপ্রকার যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। শত শত যুদ্ধে পরশু, শর, শঙ্কু, শ (বর্শাজাতীয়), প্রাস (চওড়া তরবারি জাতীয়), অসি (সাধারণ তরোয়াল), নারাচ (লোহার তী তোমর (হালকা কুঠার), ভিন্দিপাল (চওড়াফলকবিশিষ্ট মোটা দণ্ড), বৈতস্তিক (একপ ধারযুক্ত ছোট বাঁকা তরোয়াল) প্রভৃতি নানা অস্ত্রের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে

Scanned by CamScanner

সমুদ্রগুপ্ত কেবল অসাধারণ বীর ছিলেন না, তাঁর একটি কবিত্বসত্তা ও শিল্পীসত্তাও ছিল। তিনি ছিলেন কবি, কাব্যরসজ্ঞ, কাব্যতত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্যে অভিজ্ঞ, গুণিগণের পৃষ্ঠপোষক, বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ, ললিতকলায় পারদর্শী। অভিলেখে লেখা হয়েছে—"সৎকাব্য-শ্রী-বিরোধান্ বুধগুণিত-গুণাজ্ঞাহতানেব কৃত্বা বিদ্বল্লোকে' বিনাশি স্ফুট-বহু-কবিতা-কীর্তি-রাজ্যং ভুনক্তি"; "বিদ্বজ্জনোপজীব্যানেক-কাব্য-ক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিত-কবিরাজ-শব্দস্য"; "কবিমতি-বিভবোৎসারণং চাপি কাব্যম্, গুণমতিবিদুষাং ধ্যানপাত্রং য একঃ, অধ্যেয়ঃ সূক্তমার্গঃ" ; "শাস্ত্রবাক্যোদয়ৈঃ", "শাস্ত্র-তত্ত্বার্থ-ভর্তুঃ" ; "নিশিত-বিদগ্ধ-মতি-গান্ধর্ব-ললিতৈ-র্ব্রীডিতত্রিদশ-পতি তুম্বুরু-নারদাদেঃ" ইত্যাদি।

সমুদ্রগুপ্তের মানবিক গুণাবলীও অসাধারণ। ভক্তি ও নতি দ্বারাই তাঁর হৃদয় জয় করা যেত। কৃপার্হ মানুষদের প্রতি তাঁর হৃদয় ছিল কোমল। তিনি শত-সহস্র গোরু দান করতেন। তিনি দীন-দরিদ্র, অনাথ-আতুরের দুঃখমোচনের ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান লোকানুগ্রহ। তিনি যেমন শিষ্টের পালন করতেন, তেমনি দুষ্টেরও দমন করতেন। তিনি ছিলেন গূঢ়মন্ত্র (অসাধারণ মন্ত্রগুপ্তিসম্পন্ন)। অনন্তসম্পদশালী, সর্বদা অপরাধীর অভ্রান্ত দণ্ডবিধান, সর্বাতিশায়ী প্রভাব আর মৃত্যুতুল্য ক্রোধ হেতু তাঁকে কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও যমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আপন বাহুবলে বিজিত রাজাদের সম্পদ প্রত্যার্পণের জন্য তাঁর অনেক রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁর কীর্তি পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে ইন্দ্রভবনে গমন করেছিল এবং এই স্তম্ভ তারই উদ্‌ঘোষক বলে হরিষেণ বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃত কাব্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে অতিরঞ্জনরূপেই একথা গ্রাহ্য।

সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা এই অভিলেখে উল্লিখিত হয়নি। তাই সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর অভিলেখটি লিখিত— ফ্লিট সাহেবের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

আলোচ্য অভিলেখে প্রশস্তি-রচয়িতা হরিষেণের আত্মপরিচয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

বৎসভট্টি রচিত মান্দাসোর অভিলেখ—প্রথম কুমারগুপ্তের ও বন্ধুবর্মনের মান্দাসোর অভিলেখ বৎসভট্টির রচনা। এতে ৪৪টি শ্লোক আছে এবং ৪৯৩ ও ৫২৯ মালবযুগ বা কৃতযুগের (৪৩৬ ও ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের) উল্লেখ আছে। মনে হয়, বৎসভট্টি কালিদাসের উত্তরসূরী কবি। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় ঋতুসংহার ও মেঘদূতের প্রভাব আছে। লাটদেশ, দশপুর-নগর, পট্টবায়শ্রেণী এবং বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনায় কবি নিষ্ঠাভরে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অনুসরণ করেছেন। কালিদাসের মতই তিনি প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ঋতুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দশপুর ও লাটদেশের বর্ণনা পড়ে মনে আসে মেঘদূতের বিভিন্ন পুরীর বর্ণনা। গৌড়ীরীতিতে ওজোগুণ তথা দীর্ঘসমাসের বহুল ব্যবহারে অভিলেখটি রচিত। একটিমাত্র সমাস একটি সম্পূর্ণ শ্লোক জুড়ে আছে, এমন উদাহরণও এখানে আছে। অবশ্য রসের আনুগুণ্য (আনুকূল্য) মাথায় রেখে তিনি কোমল ও পরুষবর্ণের যথাযথ ব্যবহার করেছেন। যেমন বন্ধুবর্মনের জ্ঞান ও ঔদার্যের বর্ণনায় সুকুমার বর্ণ প্রয়োগ করলেও তাঁর শৌর্য বর্ণনায় তিনি পরুষবর্ণ প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি যুগ্মক, বিশেষক, কলাপক ও কুলকের ব্যবহার করেছেন।

স্কন্দগুপ্তের ভিতরি স্তম্ভলেখ ও জুনাগড় শিলালেখ ঃ উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের ভিতরিতে প্রাপ্ত স্তম্ভলেখটিতে বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তার জন্য একটি গ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে। এটি চম্পূকাব্যের ধরনে রচিত। দ্বিতীয় অভিলেখে বিখ্যাত প্রাচীন সুদর্শন হ্রদের সেতুর পুনর্নির্মাণ বর্ণিত হয়েছে। রচয়িতা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু দুটি অভিলেখেই ছন্দোবৈচিত্র্য, অলঙ্কার-প্রয়োগ-নৈপুণ্য, ভাষার স্বচ্ছতা ও ঋজুতা এবং বৈদর্ভী রীতির ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, রচয়িতা কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

যশোধর্মনের মান্দাসোর শিলাস্তম্ভ অভিলেখ ঃ এই অভিলেখে আছে রাজা যশোধর্মন্-এর (আনু. ৫২৫-৫৩৫ খ্রীঃ) প্রশস্তি। কবি বাসুল এর রচয়িতা। রচনাটিতে হরিষেণের রচনার প্রভাব আছে। প্রথম আটটি শ্লোক দীর্ঘ স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। নবম শ্লোকটি অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। বাসুল সাধারণ মানের চেয়ে উচ্চমানের কবি হলেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা তাঁর ছিল না। কাব্য সৌন্দর্যের দিক থেকে জুনাগড়ের রুদ্রদামন্-প্রশস্তি ও সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তির সঙ্গে এই অভিলেখের তুলনা চলে না। অলঙ্কারতত্ত্বের শিষ্ট মহাকাব্যের গতানুগতিকতায় এই রচনাটি ক্লিষ্ট হয়েছে। যাই হোক, রচনাটি কিছুটা কাব্যগুণের অধিকারী।

মান্দাসোর প্রস্তরলেখ ঃ এই অভিলেখটি প্রভাকরের সময়কার, ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি রবিল-বিরচিত। এতে অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, উল্লেখ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রশংসনীয় প্রয়োগে রচনাটি উত্তম কাব্যরূপে গণ্য হতে পারে।

যশোধর্মন্ ও বিষ্ণুবর্ধনের মান্দাসোর অভিলেখ—৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৩২টি শ্লোকে বিরচিত এই অভিলেখটি বিচিত্র শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত এবং উপমা-সমাসোক্তি-উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারে ভূষিত। আর্যা, ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক, শালিনী, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি বহু ছন্দের সুনিপুণ ব্যবহারে রচনাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। একটি সুন্দর উদাহরণ—

"কস্মিন্ কালে কলমৃদু-গিরাং কোকিলানাং প্রলাপা
ভিন্দন্তীব স্মর-শর-নিভাঃ প্রোষিতানাং মনাংসি।।"

মিহিরকুলের (৫১৫-৫৪৫ খ্রীঃ) গোয়ালিয়র প্রস্তরলেখ—আর্যা, মালিনী ও শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত রূপকাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত ১৩টি শ্লোকে কবি কেশব-বিরচিত এই অভিলেখে সযত্নে অর্জিত-কবি প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট। যেমন—

"তপিত-কনক-বর্ণৈরংশুভিঃ পঙ্কজানাং
অভিনব-রমণীয়ং যো বিধত্তে স বোঽব্যাৎ।।"

আলোচিত অভিলেখগুলি ছাড়াও কাব্যসৌন্দর্যের দিক থেকে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য গুপ্তযুগীয় অভিলেখগুলি হোল—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলেখ, উদয়গিরি গুহালেখ, সাঁচী অভিলেখ, প্রথম কুমারগুপ্তের (উত্তরপ্রদেশের) বিলসড় প্রস্তরস্তম্ভলেখ, বিশ্ববর্মনের রাজস্থানের গঙ্গধার প্রস্তরস্তম্ভলেখ ইত্যাদি। এই অভিলেখগুলিতে মোটামুটি মধ্যমমানের কাব্যসৌন্দর্য বিদ্যমান। বৈদর্ভীরীতিতে বিরচিত এই অভিলেখগুলির ভাষা ঋজু, স্বচ্ছন্দ ও আড়ম্বরমুক্ত। এগুলির মধ্যে ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গঙ্গধার-অভিলেখটি কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ।

Scanned by CamScanner

গুপ্তযুগের পরবর্তী ২০০ বছরে রচিত অভিলেখগুলিতে ভাষা ও রীতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। ভারবি-ভট্টি-বাণভট্ট প্রভৃতি কবিদের প্রভাবে দীর্ঘ-জটিল ছন্দের প্রতি পক্ষপাত, শ্লেষ-বিরোধাভাষাদি অলঙ্কারের আড়ম্বর ও পৌরাণিক উল্লেখের প্রাচুর্য এগুলির বৈশিষ্ট্য। উদাহরণরূপে উল্লেখযোগ্য—বলভীর (কাথিয়াবাড়ের) মৈত্রকদের শাসনসমূহ, হর্ষের বাঁশখেরা (শাহজাহানপুরের কাছে) ও মধুবন তাম্রশাসন (উত্তরপ্রদেশ), কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর (শ্রীহট্টের) তাম্রশাসনসমূহ, রবিকীর্তি-বিরচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল (কর্ণাটকের বিজাপুর) প্রশস্তি, আদিত্যশাসনের আফসড (গয়া) প্রশস্তি, লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন, সমতটের শ্রীধারণরাতের কৈলান (ত্রিপুরা) তাম্রশাসন। এগুলির মধ্যে রাজবিশেষণগুলিতে রচয়িতা কবির শ্লেষ-অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার, রাজনীতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যের পরিচয় পরিস্ফুট। নিধনপুর শাসনগুলিতে আর্যা ছন্দে রচিত পদ্যে এবং তার সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণে রচিত সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন্ ও ভাস্করবর্মনের বর্ণনা পাঞ্চালী রীতিতে বিরচিত এবং রসানুকূল অনুপ্রাসে সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি ঃ গুপ্তোত্তর যুগের অভিলেখগুলির মধ্যে এটি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তি এটি রচনা করেন। এতে আর্যা, অনুষ্টুপ্, বংশস্থবিল প্রভৃতি অল্প দৈর্ঘ্যের ছন্দের সাথে মন্দাক্রান্তা-স্রগ্ধরা প্রভৃতির মত দীর্ঘছন্দেরও সুষম ব্যবহার আছে। কবি বলেছেন—"রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত-কালিদাস-ভারবি-কীর্তিঃ।" কিন্তু কালিদাস বা ভারবির মত স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রতিভা তাঁর ছিল না। তবে কাব্যতত্ত্বাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত। কালিদাস ও ভারবির কাছে তাঁর ঋণও স্পষ্ট প্রতিভাত। কিছু ক্ষেত্রে তিনি রঘুবংশ ও কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্য থেকে প্রায় আক্ষরিকভাবে শব্দ ও রূপকল্প গ্রহণ করেছেন। যেমন—ভারবির 'পৃথুকদম্ব-কদম্বকঃ' থেকে তাঁর 'পৃথু-কদম্ব-কদম্ব-কদম্বকম্'। তা সত্ত্বেও প্রশস্তির কিছু কিছু অংশে কবির নিজস্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট। যেমন—

"স্ফুরন্-ময়ূখৈরাসি-দীপিকা-শতৈর্ব্যুদস্য মাতঙ্গ-তমিস্র-সঞ্চয়ম্।
অবাপ্তবান্ যো রণরঙ্গ-মন্দিরে কটচ্ছুরি-শ্রী-ললনা-পরিগ্রহম্।।"
"পিষ্টং পিষ্টপুরং যেন জাতং দুর্গম-দুর্গমম্।
চিত্রং যস্য কলের্বৃত্তং জাতং দুর্গম দুর্গমম্।।[৫] প্রভৃতি।

যুগের দাবিতে রবিকীর্তি অনেকক্ষেত্রে দুরূহ অলঙ্কার ও জটিল বাক্যবন্ধ প্রয়োগ করেছেন এবং অলঙ্কার প্রয়োগের মোহে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারেননি। তবু তাঁকে একজন ভাল কবিরূপে গণ্য করা যায়। এতে কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট যে, কালিদাসের আবির্ভাব ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগেই ঘটেছিল।

আদিত্যসেনের আফসড অভিলেখে নানা ছন্দে রচিত ত্রিশটি শ্লোকে অতিশয়োক্তির বাহুল্য, অতিরঞ্জিত বর্ণনা ও পৌরাণিক বর্ণনার বাহুল্য এর কাব্যসৌন্দর্যকে কৃত্রিমতাযুক্ত করেছে।

শ্রীধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসন গৌড়ী রীতিতে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। এই অভিলেখে দানপ্রাপকের বর্ণনাটি কাব্যগুণে উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ীরীতিতে বিরচিত এবং অনুপ্রাস ও দীর্ঘ সমাসে সমৃদ্ধ লোকনাথের তাম্রশাসনটির সুব্যুঙ্গ বিষয়ের আরণ্য অঞ্চলের বর্ণনাটিও উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ পালের সমসাময়িক বাদাল (দিনাজপুর) স্তম্ভলেখে রাজা দেবপালের লৌকি সীমা-অতিক্রমী বর্ণনার সাথে পালবংশের অধীনে পুরুষানুক্রমে যে ব্রাহ্মণ বংশ মন্ত্রিত্ব করেছে তার বর্ণনা আছে। তবে শ্লেষ-অনুপ্রাস-বিরোধাভাসাদি অলঙ্কারের অবিরল ব্যবহারে অনেক স ঐতিহাসিক তথ্য আচ্ছন্ন হয়েছে।

পাটনার ঘোষরাঁবায় প্রাপ্ত বীরদেবের প্রশস্তিতেও অনুপ্রাসের ও বসন্ততিলক ছন্দের ব প্রয়োগ আছে। তাঁর রচনায় হাল ও ভবভূতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গের বর্মন্-বংশীয় রাজা হরিবর্মনের (১০৭৫-১১২৫ খ্রীঃ) মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি উল্লেখযোগ্য। ভবদেবের সখা বাচস্পতি মিশ্র এগারোটি ছন্দে তেত্রিশটি শ্লোকে এটি র করেন। যমক ও শ্লেষের নিপুণ প্রয়োগ ও অন্যান্য কাব্যগুণে রচনাটি সুন্দর। সে যুগের নিরি কবিকে প্রতিভাধর বলা চলে।

বিজয়সেনের (আনু. ১১০৭-১১৫৯ খ্রীঃ) দেওপাড়া প্রশস্তি বিশেষ উল্লেখের দাবি রা লক্ষ্মণসেনের (১১৮৫-১২০৫ খ্রীঃ) সভাকবি উমাপতি ধর এটির রচয়িতা। গৌড়ী রীতি বিরচিত এই অভিলেখ শব্দচয়ন, ছন্দোবৈচিত্র্য, অলঙ্কার-প্রয়োগ, রূপকল্পরচনা, শাস্ত্রজ্ঞান-প প্রভৃতি গুণে উত্তম কাব্যরূপে গণ্য। কবি ব্যাস-বাল্মীকিকে তাঁর আদর্শরূপে বর্ণনা করেছেন নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—'পদ-পদার্থ-বিচার-শুদ্ধবুদ্ধি'। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য-লীলার ব অতি মধুর কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

"বক্ষোহংশুকাহরণ-সাধ্বস-কৃষ্ট-মৌলি-মাল্যচ্ছটা-হত-রতালয়-দীপভাসঃ।
দেব্যা-স্ত্রপা-মুকুলিতং মুখমিন্দুভাভি-বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ।

ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে গ্রথিত ইন্দোচীন, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশে আবি অভিলেখগুলির মধ্যেও কয়েকটিতে কাব্যসৌন্দর্য দেখা যায়। কাম্পুচিয়ার অনেক অভিলে কালিদাসের গভীর প্রভাব দেখা যায়। কাব্যসৌন্দর্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিদে অভিলেখের কথা বলা যায়। যেমন—দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভো কান্ অভিলেখ, কাম্পুচি নম বেসাঙ্ অভিলেখ, হান চেই অভিলেখ, প্রথম ইন্দ্রবর্মার অভিলেখসমূহ, ফিমীনকস্, (ও প্রিখান অভিলেখ। চম্পা (দক্ষিণ আনাম), ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, তাইল্যান্ড ও এশিয়াতেও বহু কাব্যগুণসম্পন্ন অভিলেখ পাওয়া গেছে। চম্পার অনেক অভিলেখ চম্পূকা সুন্দর নমুনা। মায়ানমারে আনন্দচন্দ্রের ম্রো হঙ (আরাকান) স্তম্ভলেখ (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শত সরল শৈলীতে রচিত। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ছন্দ ও ব্যাকরণের কিছু ত্রুটি আ তাইল্যান্ডে সুখোদয়ের সময়ের (১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর) চম্পূরীতিতে রচিত দুটি অভিলেখ পাওয়া গেছে। মধ্য এশিয়ার অভিলেখগুলির মধ্যে খরোষ্ঠি লিপিতে লেখা এ অভিলেখে চারটি বিভিন্ন ছন্দে ধনসঞ্চয় না করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ রয়েছে। এটির ভ প্রাকৃতের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং কয়েকটি ব্যাকরণগত ত্রুটি আছে। এটিতে কবি অনু পেয়েছেন মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ থেকে। এখানে উল্লেখযোগ্য ক অভিলেখেরই আলোচনা করা হোল।

Scanned by CamScanner

অভিলেখ থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য

বিভিন্ন অভিলেখ থেকে আমরা ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের এমন বহু তথ্য জানতে পারি যা অন্য কোন উৎস থেকে জানা যায় না। এখানে এরূপ কিছু তথ্য আলোচিত হোল।

মৌর্য সম্রাট অশোক সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জেনেছি তার অধিকাংশ প্রত্যক্ষ উৎস তাঁর অনুশাসনসমূহ। এইসব অনুশাসনে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা, 'ধম্ম', জনহিতকর কার্যাবলি, রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ অনুশাসনের লিপি ব্রাহ্মী। তবে বর্তমান পাকিস্তানের শাহবাজগড়ি ও মনশেরাতে খরোষ্ঠি লিপিতে এবং কান্দাহারে গ্রীক ও আরামাইক লিপিতে উৎকীর্ণ কিছু অভিলেখ পাওয়া গেছে। এসব থেকে বহু তথ্য জানা যায়।

আগে মৌর্য রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালায় প্রতিদিন কয়েক হাজার প্রাণীর মাংস রান্না হোত। অশোক প্রথমে মাত্র দুটি ময়ূর ও একটি হরিণের মাংসের ব্যবস্থা করেন। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তর-অনুশাসনে মানুষ ও পশুর চিকিৎসালয় স্থাপনের কথা জানা যায়। চতুর্থ প্রস্তর অনুশাসন থেকে সে যুগের প্রযুক্তিবিদ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ("বিমানদর্শনাৎ ....দিব্যানি রূপাণি দর্শয়িত্বা")। ত্রয়োদশ প্রস্তর অনুশাসনে কলিঙ্গযুদ্ধের বীভৎসতার বর্ণনা ও তারপরে অশোকের তীব্র অনুশোচনার উল্লেখ আছে এবং এতে তাঁর চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হবার কথা বোঝা যায়। অবশ্য প্রয়োজনে যে তিনি কঠোর হতে পারেন, তারও ইঙ্গিত এতে আছে। তাঁর কান্দাহার অনুশাসন থেকে জানা যায়, শিকারী ও মৎস্যজীবীরা প্রাণী হত্যা ছেড়ে কৃষিকার্যকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছিল। তিনি অল্প ব্যয় ও অল্প সঞ্চয়ের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর পঞ্চম স্তম্ভলিপি থেকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাঁর উদ্বেগের কথা জানা যায়। তাঁর ষড়্‌বিংশ রাজবর্ষে তিনি বহু পশুপক্ষীকে অবধ্য ঘোষণা করেন। তাঁর ২৬ বছর রাজত্বকালের মধ্যে ২৫ বার বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন বলেও তিনি ঘোষণা করেছেন।

বগুড়া জেলার 'মহাস্থান' নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি মৌর্যযুগীয় খণ্ডিত অভিলেখে সেযুগে কিভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা হোত তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া এতে সংবঙ্গীয় বা ষড়্‌বর্গীয় নামে একটি গোষ্ঠীর উল্লেখও গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য। মহাস্থানগড় ও তার সংলগ্ন এলাকা যে প্রাচীন পুণ্ড্রনগর, তাও এই অভিলেখ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। সোহ্‌গৌরা ব্রোঞ্জ ফলকে উৎকীর্ণ অভিলেখেও বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ভাণ্ডারগৃহ নির্মাণের উল্লেখ আছে।

রাজা ভাগভদ্রের চতুর্দশ রাজ্যবর্ষে বেসনগরে অভিলেখযুক্ত গরুড়স্তম্ভটি স্থাপন করেন ভাগবত ধর্মে আস্থাবান মহারাজ Antiakidas-প্রেরিত গ্রীক রাজদূত হেলিওদোর। তিনি লিখিয়েছেন—'হেলিদোরেণ ভাগবতেন'। একজন গ্রীক রাজদূতের ভাগবত ধর্মের প্রতি এতটা আকর্ষণ এ যুগেও আশ্চর্য মনে হয়। এই অভিলেখে পালিধম্মপদ ও মহাভারতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ আছে।

প্রথম কণিষ্কের সমকালীন সারনাথের বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য অভিলেখ থেকে সেযুগে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং বিদেশীরাও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা জানা যায়। এগুলিতে দেইসিংক বা দইসিক্—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, অবটুনাক (পৌষ-মাঘ) প্রভৃতি যবন মাসের উল্লেখও গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র ৪১ শকাব্দের 'আরা'-প্রস্তরলেখ থেকে দ্বিতীয় কণিষ্কের কথা জানা যায়। সম্ভবত তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এতে কূপ-প্রতিষ্ঠার কথা আছে এবং তা যুগ যুগ ধরে প্রাণি-রক্ষায় সাহায্য করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তির কাব্যিক মূল্য ছাড়া ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। নাগনিকা বা নাগনিকার নানাঘাট অভিলেখ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বৈদিক যাগযজ্ঞের ইতিহাস জানার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ীর ১৯তম রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ নাসিক গুহালেখে ভারতবর্ষের কুলপর্বতগুলির উল্লেখ থাকায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে ভৌগোলিক গুরুত্বও বিদ্যমান। খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তি, স্থান ও ঘটনার উল্লেখ আছে। এই অভিলেখ থেকে জানা যায় যে নন্দরাজের দ্বারা অপহৃত কলিঙ্গ জিনমূর্তি খারবেল উদ্ধার করেছিলেন। আমাদের দেশের 'ভারতবর্ষ' নামটির প্রাচীনতম উল্লেখ সম্ভবত এই অভিলেখেই পাওয়া যায় ('ভরধবসপঠানং ভারতবর্ষ-প্রস্থানম্')। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ থেকে তাঁর সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক তথ্য মিলেছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি গুহালেখে বীরসেনের বর্ণনা থেকে সে যুগের সচিবদের কাম্য গুণাবলীর কথা জানা যায়। অন্যান্য কয়েকটি অভিলেখেও এরূপ গুণের কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলেখ পাশুপত সম্প্রদায়ের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। তাঁরই সাঁচী অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, সাঁচীর প্রাচীন নাম ছিল কাকনাদবোট।

রাজা প্রথম কুমারগুপ্তের দামোদর, ধনাইদহ প্রভৃতি শাসন থেকে সে যুগের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এবং ঐ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত জানা যায়। দামোদরপুর, বৈগ্রাম, কালাইকুরি, সুলতানপুর প্রভৃতি শাসনগুলিকে জমিবিক্রয়ের এক প্রকার দলিল বলা যায়। তবু এগুলিতে দানসম্পর্কিত ধর্মানুশংসন শ্লোক আছে। এগুলিতে জমি কেবল পুরুষানুক্রমেই ভোগ্য হস্তান্তর বা বিক্রয়ের যোগ্য নয় (অক্ষয়নীবীধর্ম)—এরূপ উল্লেখ থাকায় মনে হয়, সেকালে জমির বেশিবার হস্তান্তর অভিপ্রেত ছিল না।

প্রথম কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মনের মান্দাসোর অভিলেখ থেকে রেশম শিল্পীগোষ্ঠী সম্পর্কে জানা যায় যে, লাট-(সৌমারী-ব্রোচ) অঞ্চলের রেশম শিল্পীরা দশপুর (মান্দাসোর) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পরে তীরন্দাজ, গল্প-কথক, জ্যোতিষী, যোদ্ধা প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করে। এতে বোঝা যায় যে, অন্তত পশ্চিম ভারতে বংশগত বৃত্তি গ্রহণে শিথিলতা ছিল।

স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় ও ভিতরি অভিলেখ থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে এবং রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ভিতরি স্তম্ভলেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি পুষ্যমিত্র, হূণ ও ম্লেচ্ছদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামের দ্বারাই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জুনাগড় অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চল দুর্বল এবং বহিঃশত্রুদের পক্ষে সবচেয়ে সহজভেদ্য ছিল এবং তাই দুশ্চিন্তায় বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে

Scanned by CamScanner

তিনি অবশেষে পর্ণদত্তকে সুরাষ্ট্র দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কেননা, তাঁর মধ্যেই কৌটিল্যবর্ণিত অমাত্যসম্পদের সঙ্গে তুলনীয় গুণাবলী ছিল। এই অভিলেখে সুদর্শন হ্রদের পুরাতন বাঁধটির ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণের বিবরণ আছে। পর্ণদত্তের সুযোগ্য পুত্র চক্রপালিতকে বাঁধটি পুনর্নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছিল। পরে চক্রপালিতই সুরাষ্ট্রের শাসনকর্তা হন। রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখটি এই পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে পাঠ করলে অনেক আকর্ষণীয় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে।

হূণ সম্রাট তোরমাণের কুরা ও এরাণ লেখ, মিহিরকুলের গোয়ালিয়র অভিলেখ, গোপচন্দ্রের মল্লসারুল, যশোধর্মনের মান্দাসোর অভিলেখ প্রভৃতি থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়কালে বৈদেশিক ও সামন্ত রাজাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা যায়। বাকাটক-রাজমহিষী প্রভাবতীগুপ্তার তাম্রশাসনগুলি গুপ্ত-বাকাটক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। লোকবিগ্রহের সুমন্ডল লেখ থেকে বোঝা যায় যে, অন্তত ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষীণ অস্তিত্ব বজায় ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভানুগুপ্তের এরাণ অভিলেখে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় প্রবরসেনের চম্পক অনুশাসনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণেরাও বিশেষ কয়েকটি অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে রাজা তাঁদের দেওয়া জমি কেড়ে নেবেন এবং তাতে রাজার কোন দোষ হবে না। এরূপ নানা অভিলেখ থেকে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের অপরাধ ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য তথ্য পাই। এসবে দিব্য প্রমাণেরও উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতীয় চোল-শাসনগুলিতে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পুলকেশীর ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইহোল অভিলেখ থেকে আমরা চালুক্যবংশের ইতিহাস, তাঁর দিগ্বিজয় ইত্যাদি তথ্য জানতে পারি। আবার এতে কালিদাসের নাম থাকায় কালিদাসের আবির্ভাবকালকে আর ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বলা যায় না।

ধর্মপালের খালিমপুর অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি অর্থাৎ সেই সময়কার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জন-প্রতিনিধি, স্থানীয় ভূস্বামী বা সামন্তবৃন্দ বপ্যটপুত্র শ্রীগোপালকে রাজারূপে নির্বাচন করেন। এটি একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা যা অন্য কোন আকরে তেমনভাবে বলা হয়নি। আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর ধরে বাংলায় এই অরাজকতা চলেছিল। সুতরাং বাংলার ইতিহাসে খালিমপুর অভিলেখের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাল, চন্দ্র, বর্মন্ ও সেন রাজাদের অভিলেখগুলিতে বঙ্গ ইতিহাসের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ রয়েছে। দেবপালের নালন্দা অভিলেখ থেকে জাভার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের সঙ্গে পালবংশের রাজাদের সম্পর্ক বিষয়ে নানা তথ্য জানা যায়। তাছাড়া বৌদ্ধ বিহারের খরচ চালাবার জন্য পাঁচটি গ্রাম দানের কথা এতে বলা হয়েছে। ভারতবর্ষে সামন্ত প্রথার উদ্ভবের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এরূপ ভূমিদানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। শ্রীচন্দ্রের 'রামপাল' (ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ) তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র তাঁর পৈতৃক রাজ্যের সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপ (বর্তমান বাখরগঞ্জ) ও হরিকেলকে (শ্রীহট্ট)

যোগ করার ফলে বংশের মধ্যে প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। শ্রীচন্দ্রের 'পশ্চিমভাগ'-শাসনের চতুর্দশ শ্লোকে আছে—শত্রু জয় করে শ্রীচন্দ্র যবন-রমণীগণের বক্ষে অঙ্কিত রঙীন চন্দন-পত্রলেখা মুছে দিয়েছিলেন, হূণ রমণীদের কপোল ও উদরকে শোকজনিত ক্ষতচিহ্নে পূর্ণ করেছিলেন এবং মদ্যপানে উন্মত্ত উৎকল রমণীগণের দৃষ্টির চাঞ্চল্য স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। এ থেকে সে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর রমণীদের নানা প্রথা ও অভ্যাস সম্বন্ধে চমকপ্রদ তথ্য জানা যায়। শোকার্ত হূণ রমণীদের এরূপ প্রথা রঘুবংশের সাক্ষ্যেও সমর্থিত হয়। ভোজবর্মনের বেলাব (ঢাকা) তাম্রশাসনে জাতবর্মার কীর্তি বর্ণনায় 'শ্রী' শব্দটি নিয়ে খেলাচ্ছলে বজ্রবর্মা, জাতবর্মা, বীরশ্রী ও লক্ষ্মীবর্মনের উল্লেখ পাই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই নামগুলি পাই। সেনরাজ বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্থাপত্য শিল্পের বি[illegible] পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এতে দেবদাসী প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রশস্তি কবি উমাপতিধর সেনবংশের প্রশংসা করে সেন রাজাদের দরিদ্র-ভরণকারী বলেছেন। কি[illegible] সমসাময়িক অন্যান্য আকর থেকে জানা যায় যে, তাঁদের আমলে সাধারণ মানুষের আর্থি[illegible] অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে বোঝা যায় যে, ঐ সময় বঙ্গে শিল্পীদের নিয়মিত বা অনুমোদিত কোন গোষ্ঠী বা দল ছিল। এই প্রশস্তিতে সেনে[illegible] 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়েছে। এ থেকে সেযুগে বর্ণ-পরিবর্তনের এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া [illegible] যে, সেনেরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে ক্ষত্রিয় হন। এরূপ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতা[illegible] শেষভাগে রচিত মহীশূরের তালগুণ্ডা অঞ্চলের কদম্বরাজ শান্তিবর্মনের একটি অভিলেখ থেকে জানা যায় যে এই বংশের প্রথম রাজা ময়ূরশর্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর বংশধর 'শর্মা' উপাধি ত্যাগ করে ক্ষত্রিয় সূচক 'বর্মা' উপাধি গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন অভিলেখে অনেক রাজার ধর্ম সম্পর্কে ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া [illegible] গুপ্তরাজগণ নিজেদের পরম ভাগবত বললেও তাঁদের নানা অভিলেখে শৈব, কার্তিকেয়, [illegible] ও বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ থেকে তাঁদের সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার কথা জানা যায়। সম্রাট হর্ষবর্ধ[illegible] বাঁশখেরা ও মধুবনশাসন থেকে জানা যায়, তিনি নিজে ছিলেন শৈব, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছি[illegible] আদিত্যভক্ত এবং তাঁর দাদা রাজ্যবর্ধন ছিলেন পরম সৌগত। তিনি নিজে পরে বৌদ্ধ[illegible] আস্থাবান হন। একই বংশে এরূপ ধর্মসমন্বয় বিস্ময় জাগায়।

বঙ্গ ও মগধের পাল রাজবংশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবন[illegible] তাম্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে মহেন্দ্রপাল সম্পর্কে নানা সংশয় ছিল। খ্রীষ্টীয় [illegible] শতাব্দীর শেষভাগে একজন মহেন্দ্রপাল বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা [illegible] কিন্তু তিনি ছিলেন গুর্জর-প্রতীহার-বংশীয়। কিন্তু উক্ত অনুশাসন থেকে নিশ্চিতভাবে জানা [illegible] যে, গোপাল, ধর্মপাল ও দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল ৮৪১ বা ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতার [illegible] সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ছিলেন দেবপালের জ্যেষ্ঠপুত্র। আগে ধারণা ছি[illegible] দেবপালের মৃত্যুর পর মহেন্দ্রপালের অনুজ শূরপাল ৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ [illegible] রাজত্ব করেন। কিন্তু উক্ত তাম্রশাসনটি মহেন্দ্রপালের সপ্তম রাজ্যবর্ষে প্রচারিত হওয়ায় [illegible] গেল যে, শূরপালের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নয়।

Scanned by CamScanner

বল্লালসেনের ভাগলপুর অঞ্চলের সনোখার অভিলেখটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এটির আবিষ্কারের আগে পূর্ব বিহারের সেনরাজাদের আধিপত্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সোমনাথের কাছে সোমনাথ-নগরের বাইরে নাখোদা-নুর-উদ্দিন ফিরুজের ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি অভিলেখ উল্লেখযোগ্য। এতে সংস্কৃত অভিলেখের সঙ্গে আরবিতে তার একটি সংক্ষিপ্তসার আছে। এ থেকে জানা যায় যে, তিনি সোমনাথ শহরের বাইরে দুই হিন্দু পুরোহিতের কাছ থেকে একটি মসজিদ স্থাপন এবং তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু ভূসম্পদ ও অন্য সম্পত্তি কেনেন। এই অভিলেখে সংস্কৃতে নুরউদ্দিনকে 'ধর্মবান্ধব' বলা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভবত বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, হিন্দু পুরোহিতগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত এবং সে বন্ধুত্ব ছিল ধর্মসঙ্গত বা ন্যায়সম্মত। উক্ত মিজিগিতি (মসজিদ) প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্যোগ সোমনাথের প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহায়তা পেয়েছিল। সংস্কৃতে অভিলেখটির শুরুতে বিশ্বনাথ, শূন্যরূপ, বিশ্বরূপ, লক্ষ্যালক্ষ্য নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো হয়েছে। ইনি যে বিশ্বেশ্বর শিব নন, 'আল্লা' তা এ থেকে বোঝা যায়।

এরূপ আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিলেখ আছে। সবগুলির আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে শুধুমাত্র অভিলেখ সাহিত্যের একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম রুদ্রদামার জুনাগড় (গিরনার শিলালেখ)

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে পাহাড়ের গায়ে অথবা পাথরে খোদাই করা বেশ কিছু লেখা পাওয়া গেছে। এগুলিকে শিলালিপি বা শিলালেখ বলে। এগুলির মধ্যে সম্রাট অশোকের শিলালিপিগুলি খুবই প্রসিদ্ধ। এগুলিতে প্রধানত নানা উপদেশ খোদিত আছে। এগুলি ছাড়া আরও অনেক শিলালেখ আছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি যথেষ্ট কাব্যগুণসমন্বিত। এগুলির মধ্যে শক সম্রাট মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের প্রশস্তি সম্বলিত জুনাগড় শিলালেখটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। জুনাগড়ে গির্ণার পাহাড়ের গায়ে এই লেখটি দেখা যায়। তাই এটিকে গির্ণার শিলালেখও বলা হয়। লেখটিতে 'গিরিনগর' কথাটি আছে। সম্ভবত গিরিনগর কথাটি থেকে গির্ণার নামটি এসেছে। এই শিলালেখে ৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা আছে। সুতরাং ঐ বছরে বা তার কিছু পরে কোন সময়ে শিলালেখটি রচিত ও খোদিত হয়েছিল। কালক্রমে শিলালেখটির কিছু কিছু অংশ ভেঙে গেছে বলে পাঠ্যাংশে সে সব অংশে 'ভট' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং তাই অনেক ক্ষেত্রে অর্থবোধের জন্য অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে। রচনাটি পাঠ করলে রুদ্রদামনের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তাই শিলালেখটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আবার যথেষ্ট কাব্যগুণ সমন্বিত বলে রচনাটির কাব্যমূল্যও অনস্বীকার্য। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি স্ফুট, লঘু, মধুর, বিচিত্র ও কান্তিগুণসম্পন্ন শব্দে এবং সুন্দর সুন্দর অলংকারে সমৃদ্ধ গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য রচনাতে নিপুণ ছিলেন। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সেই প্রাচীন যুগেও ভারতে বহু গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য রচিত হত এবং কাব্যতত্ত্ব নিয়েও নানা আলোচনা হত। সম্ভবতঃ কিছু অলংকারশাস্ত্র বা কাব্যতত্ত্বগ্রন্থ-ও সে যুগে প্রচলিত ছিল। সুতরাং রুদ্রদামনের শিলালেখটি যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী।

গুজরাতের জুনাগড় শহর থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত গির্নার পাহাড়ের পশ্চিম পাশের গায়ে চূড়ার কাছাকাছি অংশে প্রথম রুদ্রদামার প্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। এই পাহাড়ের গায়ে সম্রাট অশোকের গির্নার অনুশাসনসমূহ এবং স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তিও খোদিত আছে। পণ্ডিত ব্যুহ্লারের মতে আলোচ্য অভিলেখটির অক্ষরগুলি দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণমালার পূর্বসূরী। অভিলেখটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বিশটি পঙ্ক্তিতে বিভক্ত এই অভিলেখটির প্রথম ষোলটি পঙ্ক্তির বেশ কিছু অংশ পর্বতগাত্রের ক্ষয়জনিত কারণে কেবল আংশিকভাবে পড়া যায়; বাকি অংশ অনুমান করে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিলেখটিতে বেশ কিছু বানান ও শব্দপ্রয়োগ পাণিনি-ব্যাকরণ-সম্মত নয়। যেমন—বিষয়াণাং পতিনা, অন্যত্র সংগ্রামেষু, আগর্ভাৎ

Scanned by CamScanner

সংস্কৃতে রুদ্রদামার জুনাগড় (বা গির্ণার) শিলালেখের সমালোচনা

গুর্জর-প্রদেশস্য জুনাগড়ে গির্ণার-পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণঃ শিলালেখঃ মহাক্ষত্রপেন প্রথম রুদ্রদাম্না কারিতঃ। অস্মিন্ শিলালেখে দ্বিসপ্ততি-তম-শকাব্দস্য সমুল্লেখাৎ তস্মিন্ সংবৎসরে (পঞ্চাশদুত্তর-শতে খ্রীষ্টাব্দে) অথবা তদুত্তরাল্পকালমধ্যে এষ শিলালেখঃ কারিত ইতি মন্যতে। গির্ণার-পর্বতগাত্রে খোদিতত্বাদেষ শিলালেখঃ গির্ণার-শিলালেখ ইত্যপি অভিধীয়তে।

পূর্বোক্তে বর্ষে প্রবলঝঞ্ঝাবাতেন অবিরল-বর্ষণেন চ সুবর্ণসিকতা-পলাশিনী প্রভৃতি-নদীনাং প্রবর্ধিত-স্রোতোবেগেন তত্রস্থস্য সুদর্শনহ্রদস্য সেতুঃ বিধ্বস্তঃ অভবৎ। তেন চাসৌ হ্রদঃ মরুতুল্য-জলশূন্যঃ অভবৎ। জলাভাবেন চ নিকটস্থ-জনপদবাসিনাং হাহাকারঃ সঞ্জাতঃ। তেষাং সুখবিধানার্থং স্বব্যয়েন রুদ্রদাম্না অসৌ সেতুঃ পুনরপি দৃঢ়তরং নির্মাণিতম্। ইদং পুনর্নির্মাণমেবাস্য অভিলেখস্য মূলং বস্তু। প্রসঙ্গক্রমেণ তু অস্মিন্ অভিলেখে রুদ্রদাম্নঃ গুণাঃ কীর্তয়শ্চ বর্ণিতাঃ। অস্য অভিলেখস্য রচয়িতুঃ কবের্নাম ন জ্ঞায়তে।

ইদানীন্তনকালং যাবৎ উত্তমকাব্যগুণসম্পন্নাঃ যে সংস্কৃতাভিলেখাঃ আবিষ্কৃতাঃ তেষু অয়ং প্রাচীনতমঃ। কাব্যসৌন্দর্যেণ অয়মভিলেখঃ উত্তম-কবীনাং রচনাভিঃ তুল্যঃ। অস্য অভিলেখস্য প্রসাদগুণেন ওজোগুণেন চ সমন্বিতম্ ঋজুগদ্যং বৈদর্ভীরীতিং প্রকটয়তি। অত্র ভয়ঙ্কর-ঝঞ্ঝাবাতস্য যাদৃশী বর্ণনা কৃতা তাদৃশী তু সংস্কৃতসাহিত্যে অঙ্গুলিমেয়া। দণ্ডি-সুবন্ধু-বাণভট্টানাং কাব্যেষু উপলব্ধস্য গদ্যস্য অগ্রজভূতা অস্যাভিলেখস্য গদ্যরচনা। অস্মিন্ প্রাচীন-সংস্কৃত-কাব্যতত্ত্বোক্তাঃ বিবিধ-গুণাশ্চ বর্ণিতাঃ। দণ্ডিপ্রণীত-কাব্যাদর্শ-বর্ণিতৈঃ গুণৈঃ সহ তেষাং সাযুজ্যং লক্ষ্যতে। রুদ্রদামা স্বয়ম্ উত্তমকবিরপি আসীদিত্যত্র বর্ণ্যতে। তৎকালে কাব্যরচনায়াঃ আদর্শঃ কীদৃশ আসীৎ তদস্মাৎ লেখাৎ জ্ঞায়তে। অস্মিন্ অভিলেখে যমকানুপ্রাসাদি-শব্দালঙ্কারাণাং রসানুগুণপ্রয়োগো দৃশ্যতে। অসামান্য-কাব্যগুণ-সম্পন্নস্যাপি অস্য অভিলেখস্য ভাষায়াং কেচিদ্ ব্যাকরণ-নিয়ম-লঙ্ঘন-দৃষ্টান্তাঃ দৃশ্যন্তে। তদ্ যথা—'অন্যত্র সংগ্রামেষু', 'আ গর্ভাৎ প্রভৃতি' ইত্যাদয়ঃ। অত্র প্রাকৃতভাষায়াঃ প্রভাবঃ কারণং ভবেৎ। তথাপি তস্যাঃ রচনায়াঃ কাব্যগুণঃ ন খর্বীকৃত ইতি শম্।

রাজা চন্দ্রের মেহ্‌রৌলি লৌহস্তম্ভলিপি

মূল পাঠ

যস্যোদ্বর্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহব-বর্তিনোঽভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্যানিলৈর্দক্ষিণঃ ।। ১ ।।

খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্যা কর্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহা-
ন্নাদ্যাপ্যুত্সৃজতি প্রণাশিত-রিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্।। ২।।

প্রাপ্তেন স্বভুজার্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্র-চন্দ্র-সদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়া বিভ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ।। ৩।।

আলোচনা ঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপিতে এই অভিলেখটি একটি শুণ্ডাকৃতি লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ হয়েছে। লিপির অক্ষরগুলি কৌণিক, অলঙ্কারবহুল, প্রশস্ত মাত্রা-যুক্ত। এই লিপি গুপ্তযুগে মথুরা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপির প্রতিনিধি। অক্ষরগুলির ছাঁচ আগে তৈরী করে সেগুলিকে ঠুকে ঠুকে স্তম্ভের গায়ে বসানো হয়েছিল। তাই গুপ্তযুগের অন্যান্য অভিলেখে প্রাপ্ত অক্ষরগুলি গোলাকার ধাঁচের হলেও এগুলি একটু কৌণিক হয়েছে। অভিলেখটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

নূতন দিল্লী থেকে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দূরে মেহরৌলিতে (প্রাচীন নাম মিহিরপুরী) কুতুবমিনারের কাছে কুবত-উল্-ইসলাম মসজিদে স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। এই লৌহস্তম্ভে আজো মরচে ধরেনি, যা সে যুগের ধাতুবিদ্যার পরম উৎকর্ষের প্রমাণ। এটি প্রথমে বিষ্ণুপদগিরিতে স্থাপিত হয়েছিল। পরে কোন এক রাজা এখানে নিয়ে আসেন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মতে বিষ্ণুপদগিরি হল হরিদ্বারের 'হরি কি চরণ' নামক স্নানতীর্থ বা তার নিকটস্থ স্থান ;জয়সোয়ালের মতে হরিদ্বারের কাছে বিষ্ণুপদী, রামায়ণ-মহাভারত অনুসারে এটি কুরুক্ষেত্র ও বিপাশা নদীর নিকটবর্তী ; জে. সি. ঘোষের মতে গুরুদাসপুর ও কাংড়ার সীমানায়। প্রভাকর ও বাল

Scanned by CamScanner

সু-ব্রহ্মনিয়মের মতে এটি বিদিশা ও সাঁচীর নিকটবর্তী বর্তমান উদয়গিরি যেটি কর্কটক্রান্তিরেখার ঠিক উপরে অবস্থিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

এই অভিলেখে শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত তিনটি শ্লোকে চন্দ্র নামে এক রাজার প্রশস্তি আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এটি মরণোত্তর প্রশস্তি। তবে প্রভাকর ও বালসুব্রহ্মনিয়ম্ বলেছেন যে, মুদ্রাদি সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, প্রশস্তিটি মরণোত্তর হতে পারে না। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিলেখে উল্লিখিত 'চন্দ্র'। তিনি পরিণত বয়সে স্তম্ভটি তৈরী করান এবং তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত প্রশস্তিটি খোদাই করান। অবশ্য এই রাজা চন্দ্রের পরিচয় সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কারো কারো মতে এটি প্রথম কনিষ্কের অপর নাম, কারো কারো মতে ইনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, কারো কারো মতে গুপ্তরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, আবার কারো কারো মতে পুষ্করণার অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা। তবে দীনেশচন্দ্র সরকার অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, অভিলেখে বর্ণিত রাজা চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।

বিষয়বস্তু : অভিলেখটিতে মহারাজ চন্দ্রের (সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের) বীর-বিক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—মহারাজ চন্দ্রের বাহুতে খড়্গ দ্বারা যশ খোদিত হয়েছিল ("অভিলিখিতা খড়্গেন কীর্তির্ভুজে") ; অর্থাৎ বিভিন্ন যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তাঁর বাহুতে তথা শরীরে যে সকল ক্ষত তৈরী হয়েছিল, সেগুলি তাঁর যশই ঘোষণা করত। বঙ্গদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত আক্রমণকেও তিনি অনায়াসে প্রতিহত করেছিলেন। সিন্ধুনদের সপ্তমুখ পার হয়ে যুদ্ধ করে তিনি বাহ্লীকদেশ জয় করেছিলেন ("তীর্ত্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জিতা বাহ্লিকাঃ")।

[বি. দ্র : বাহ্লীক দেশ ভাণ্ডারকরের মতে বিপাশা নদীর নিকটবর্তী বল্‌খদেশ ; দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে বিপাশাদি নদীর মাঝে অবস্থিত পাঞ্জাব, ডিস্‌কল্‌করের মতে আধুনিক সিন্ধু প্রদেশ]। দক্ষিণসমুদ্রও তাঁর কীর্তিসৌরভে অদ্যাবধি সুরভিত। ["যস্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্যানিলৈর্দক্ষিণঃ"]। আপন বাহুবলে জয় করা ধরণীকে দীর্ঘকাল একচ্ছত্রভাবে শাসন করে যেন নূতন দেশ জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে তিনি অন্য পৃথিবীকে আশ্রয় করেন (অর্থাৎ পরলোকগমন করেন)। কিন্তু তিনি সমস্ত শত্রু বিনাশ করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও আজও তাঁর প্রতাপ এই ধরণীতে উত্তাপের সঞ্চার করছে ; যেমন মহারণ্যে দাবানল প্রশমিত হলেও তার তাপ থেকে যায়। চন্দ্ররাজের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চন্দ্রের মত সুন্দর। তিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশত বিষ্ণুপদগিরিতে ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ (স্তম্ভ) স্থাপন করেছিলেন।

[বি. দ্র : অনেকের মতে বিষ্ণুপদগিরি হল এখনকার উদয়গিরি যা বিদিশা ও সাঁচীর সন্নিকটে কর্কটক্রান্তিরেখার ঠিক উপরে অবস্থিত। সূর্যের উত্তরায়ণকালে প্রভাতে এই স্তম্ভের ছায়া উদয়গিরির ১৩ নম্বর গুহায় অনন্তশয়ন বিষ্ণুর পদমূল স্পর্শ করত। সুতরাং স্তম্ভটি জ্যোতির্বিদ্যার দিক থেকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

ছায়া সম্পর্ক গুহায় পাওয়া তারিখ সম্বলিত সমকালীন অভিলেখ থেকে [illegible] যে, ৪০২ খ্রীষ্টাব্দে স্তম্ভটি ঐ স্থানে ছিল।]

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হয়ে [illegible] কোন স্থান অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। [illegible] মতে সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঐ অঞ্চল লুণ্ঠন করতে গিয়েছিলেন।

অভিলেখের দক্ষিণ জলনিধি মানে [illegible] মহাসাগর। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের [illegible] কুবেরনাগার প্রভাবতী নামে এক কন্যার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের [illegible] বিবাহ হয়েছিল। বাকাটকেরা তাঁর প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি। [illegible] চন্দ্রগুপ্তের কীর্তিসৌরভে দক্ষিণসমুদ্র সমৃদ্ধ বলা হয়েছে। [illegible] কথা অন্য কোন লিপিতে পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই গুপ্তবংশের প্রথম পরম বিষ্ণুভক্ত সম্রাট এবং [illegible] পুনরুজ্জীবনের অন্যতম হোতা ছিলেন।

অভিলেখটি যথেষ্ট কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। এর রচয়িতা অজ্ঞাত কবি [illegible] অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও [illegible] অলঙ্কারের সুন্দর সন্নিবেশ আমাদের মুগ্ধ করে। এত স্বল্প পরিসরে [illegible] বীররসের সার্থক প্রয়াসও তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।

দু নম্বরের সংস্কৃতে প্রশ্নোত্তর

১। কুত্র কদা কয়া লিপ্যা কয়া ভাষয়া মেহরৌলী-স্তম্ভাভিলেখ উৎকীর্ণঃ?

উত্তর। দিল্লীনগরীং নিকষা মেহরৌলী নামক গ্রামে কুতুবমিনারস্য সমীপে [illegible] উত্তরাঞ্চলীয় ব্রাহ্মীলিপ্যা সংস্কৃতভাষয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতকস্য উত্তরার্ধে [illegible] বা মেহরৌলী-স্তম্ভাভিলেখঃ উৎকীর্ণঃ অভবৎ।

২। **কিং বিষয়বস্তুমবলম্ব্য মেহরৌলী-স্তম্ভাভিলেখঃ রচিতঃ?**

উত্তর। চন্দ্রনামকস্য কস্যচিদ্ রাজ্ঞঃ প্রশস্তিমূলকঃ মেহরৌলী-স্তম্ভাভিলেখঃ [illegible] বিষ্ণুধ্বজপ্রতিষ্ঠা বিষয়ম্ প্রসঙ্গক্রমেণ চ তস্য রাজ্ঞঃ সামরিককৃতিত্ব [illegible] মেহরৌলী-স্তম্ভাভিলেখঃ উৎকীর্ণো বভূব।

৩। **মেহরৌলী-স্তম্ভলেখঃ যস্য স্তম্ভস্য গাত্রে উৎকীর্ণঃ স্তম্ভঃ বর্ণ্যতাম্।**

উত্তর। মেহরৌলী স্তম্ভলেখঃ যস্য স্তম্ভস্য গাত্রে উৎকীর্ণঃ তস্য স্তম্ভস্য উচ্চতা [illegible] ত্রয়োবিংশ ফুট-পরিমিতা। এষ স্তম্ভঃ লৌহময়োঽপি অদ্যাপি ধাতুমলবিহীনঃ। [illegible] বিষয়ঃ তৎকালে উত্তরভারতে ধাতুবিদ্যায়াঃ বিস্ময়জননীং সমুন্নতিং প্রকটয়তি।